Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501058 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Critical Perspective on 'Dakghar': A Theoretical Review
'ডাকঘর' নাটক সম্পর্কিত তাত্ত্বিক মত-পার্থক্য: একটি পর্যালোচনা

Kathakali Ganguly
Researcher
Bengali Department
Rabindra Bharati University

Received on: 28th April 2026
Accepted on: 14th May 2026

Abstract:
Rabindranath Tagore's 'Dakghar' (1911) represents a very important role within the corpus of Bengali dramatic literature. Since its inception, the play has elicited to a wide array of divergent interpretations from both scholars and theatre practitioners, reflecting its rich and multilayered philosophical dimentions. The way the play is understood and performed, has changed significantly depending on various ideologies. Notably, Tagore himself incorporated musical elements into the 'Dakghar' production that were absent in the original written script. This research aims to document the different scholarly discourses. Because the play offers not only a history of evolving stage practices but also a range of critical readings. By comparing these varying viewpoints, this paper seeks to explore a comparative analysis of diverse perspectives on 'Dakghar', with the aim of understanding the multiplicity of its textual and philosophical significance.

Key Words:
Rabindranath Tagore, 'The Post Office', play, death, liberation, soul, allegory

মূল প্রবন্ধ

রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে একটি কৃশকায় নাটক হলো 'ডাকঘর'। নাটকটি লেখা হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই নাটকের মঞ্চায়ন করেছিলেন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। তৎপূর্বে 'ডাকঘর' ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এবং সেই অনুবাদের ভিত্তিতে আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনের অ্যাবি থিয়েটারে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে 'ডাকঘর' অভিনীত হয়। স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই নাটকটিকে ঘিরে পণ্ডিতমহলে এবং নির্দেশকদের হাতে ভিন্ন পাঠ রচিত হয়েছে। 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়গত ও তত্ত্বগত আঙ্গিকের পাঠান্তর লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে দেশকালের ভিত্তিতে তা কত পৃথক ভাবাদর্শ অবলম্বন করেছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়ের সময় গানের সংযোজন করেছিলেন যা পাঠ্যে নেই। আবার অতিরিক্ত চরিত্র সংযোগ করার তথ্যও পাওয়া যায় যা কিনা 'ডাকঘর'এর লিখিত পাণ্ডুলিপির থেকে আলাদা। এই নাটকের মঞ্চগত পরিবর্তনের এক ইতিহাস যেমন আমরা জানতে পারি; তার পাশাপাশি নাটকটির পাঠ সংক্রান্ত একাধিক মূল্যায়ন হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে আমরা 'ডাকঘর' নাটক সম্পর্কিত বিদ্বজনের ভিন্ন মত যথাসম্ভব তুলনামূলক বিশ্লেষণের নাটকের পাঠপ্রতিক্রিয়া অনুধাবন করব।

© Santiniketan Sahityapath

'ডাকঘর' যখন লেখা হচ্ছে তখন রবীন্দ্র-মননের অনুক্রম দেখলে আমরা আন্দাজ করতে পারব যে দীর্ঘদিনের সংসার ভার, ক্লান্তি, রাজনৈতিক বাতাবরণ রবীন্দ্রনাথকে ক্লান্ত করে তুলেছিল —

অন্তরগ্লানি সংসারভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার যদি রাখিবারে পাই[১]

বাইরের বেরনোর ডাক যেন শুনতে পাচ্ছিলেন কবি। ঘর ও পথের দ্বন্দ্বে উতলা হয়ে উঠেছিলেন। এমতাবস্থায় শান্তিনিকেতনে বসে মাত্র তিনদিনে লিখেছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের সবচেয়ে ছোটো আকারের নাটক 'ডাকঘর'। আলোচনার সুবিধার জন্য 'ডাকঘর' নাটকের পূর্বে রচিত নাটকের একটি তালিকা দিলাম —

১। 'বাল্মীকি প্রতিভা' — ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ (গীতিনাট্য)
২। 'কালমৃগয়া' — ১৮৮২ (ওই)
৩। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' — ১৮৮৩ (নাট্যকাব্য)
৪। 'নলিনী' — ১৮৮৪ (প্রথম গদ্য নাটক)
৫। 'মায়ার খেলা' — ১৮৮৮ (নলিনী নাটকের গীতিনাট্য রূপ)
৬। 'রাজা ও রাণী' — ১৮৮৯ (নাট্যকাব্য)
৭। 'বিসর্জন' — ১৮৯০ (ওই)
৮। 'চিত্রাঙ্গদা' — ১৮৯২ (ওই)
৯। 'গোড়ায় গলদ' — ১৮৯২ (প্রহসন)
১০। 'বিদায় অভিশাপ' — ১৮৯৩ (নাট্যকাব্য)
১১। 'মালিনী' — ১৮৯৬ (কাব্যনাট্য)
১২। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' — ১৮৯৯ (নাট্যকাব্য পরে 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ)
১৩। 'চিরকুমার সভা' — ১৯০৪
১৪। 'হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক' — ১৯০৭
১৫। 'শারদোৎসব' — ১৯০৮
১৬। 'মুকুট' — ১৯০৮
১৭। 'রাজা' — ১৯১০
১৮। 'অচলায়তন' — ১৯১১
১৯। 'ডাকঘর' — ১৯১১

দেখা যায় 'মালিনী' নাটকের পর দীর্ঘ সময় ধরে রবীন্দ্রনাথ নাটকের বিষয়ে বিশেষ কোনো আলোকপাত করেন নি, বলা ভালো এই সময় তিনি নাটক রচনার বদলে অন্যান্য সাহিত্য রচনায় ব্রতী ছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে 'শারদোৎসব' (১৯০৮) নাটক রচনার মধ্য দিয়ে গদ্য নাটকে এক নতুন উপাদানের আনয়ন করলেন। মুক্তিচেতনা ও জীবনদেবতার নানা রূপ কবির রচনায় ভিন্ন ভিন্ন নামে উঠে আসতে লাগল। কবির চেতনায় ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন যেমন একদিকে বিকশিত হয়েছে তেমনি মানুষকে ভেবেছেন বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড সত্তা রূপে। প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্য ইত্যাদি সকল রসের সন্ধান পেয়েছিলেন 'খেয়া' (১৯০৬) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লেখার সময়। কিন্তু এই সকল রসের আধার যে অনির্বচনীয়তা, কবি সেই উৎসে পৌঁছাতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। সেই ব্যাকুলতাই কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) ও 'গীতালি' (১৯১৫)। তবে, এই দুই কাব্যগ্রন্থে কবিচিত্তের লীলাময় ছবি দেখা যায় না। বরং এখানে কবির বেদনা, ব্যর্থতা, সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতীন্দ্রিয় জগতের এক অনির্বচনীয়তা লালিত হয় কবির মনে এবং তারই প্রকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও নাটকে।

© Santiniketan Sahityapath

‘ডাকঘর’এর অমলও খানিক কবির মতোই সুদূরবিলাসী ও কল্পনাপ্রবণ। সে ঘরে আটকে থেকেও যেন দূর দেশের রঙিন ছবি আঁকতে পারে। তার মনের ইচ্ছে রাজাকে বলে সে ডাকহরকরার কাজ নেবে। যেমন রয়েছে বাদল ডাকহরকরা ও শরৎ ডাকহরকরা। ঋতুর অনুষঙ্গ এসে পড়ে নাটকের মধ্যে,

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে[২]

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে চর্চার অভাব বাংলা ভাষায় নেই। নানান দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে আলোচনা হয়ে চলেছে। একদিকে যেমন নাটকের বস্তুগত দিক, অন্যদিকে তেমনি তত্ত্বগত আলোচনা হয়েছে। আবার মঞ্চের নিরিখেও রবীন্দ্রনাথের নাটকের মূল্যায়ন হয়েছে।

‘ডাকঘর’ নাটক সম্পর্কিত যে যে পাঠ আমরা অধ্যয়ন করেছি তার তালিকা করলে ভিন্ন মতপার্থক্য স্পষ্টই বোঝা যায়। স্বয়ং লেখক ‘ডাকঘর’র ব্যাখ্যা করেছেন, নাটক রচনার পূর্বে তাঁর মনের অনুভুতি জানিয়ে চিঠি লিখে। আবার ‘ডাকঘর’ নাটকের বিষয়ে প্রাবন্ধিকদের নানা মত থেকে অন্যান্য তথ্যও উঠে আসে। ‘ডাকঘর’ নাটকের সমালোচনাভিত্তিক যে পাঠান্তর তৈরি হয়েছে আমরা এবারে তার সারসংক্ষেপ আলোচনা করে দেখব নাটকের গ্রহণযোগ্যতা কীভাবে বদলে গেছে পণ্ডিতদের কাছে।

১। ‘কাব্যপরিক্রমা’, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা, ১৩২২, পৃ. ৫৪-৬৯ —

অজিতকুমার চক্রবর্তী ‘ডাকঘর’কে জীবনের নাটক হিসেবে দেখেছেন। এই নাটকের সঙ্গে ব্রাউনিং এবং মেটারলিঙ্কের নাটকের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। আসলে নাটকের মধ্যেকার অধ্যাত্মবোধকে বিশ্ববোধে ব্যাপ্ত করে সত্যের সন্ধান করেছেন তিনি। কোথাও তাঁর মনে হয়নি ‘ডাকঘর’ সম্পূর্ণই রূপকের জালে মোড়া নাটক। তিনি ‘সোনার তরী’ (১৮৯৮) কাব্যগ্রন্থের সূচনা থেকে রবীন্দ্ররচনায় এক ইশারার খোঁজ পেয়েছেন। ‘রাজা’ নাটককেও এই ইশারার শ্রেণিভুক্ত করেছেন তিনি। তাঁর মতে এই রচনাগুলির মূলভাব আদতে একই শুধু তারা রূপে পৃথক। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ করতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ সিম্বল বা বিগ্রহের আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ অরূপের এই অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। রূপ দিয়েও তাকে ব্যক্ত করা যায় না। রূপের সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু অরূপকে কখনই নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা যায় না। তার বিস্তার কোনো গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। তাই অরূপ প্রকাশের সহায়ক হিসেবে আসে উপমা বা রূপক। তা কেবল সহায়ক মাত্রই, কখনো সমগ্র রচনাকে অধিকার করে বসে না। উপমার ব্যবহার হলো আলগা, তাই তাকে সরিয়ে নিলেই আসলের সন্ধান পাওয়া যায়। এই উপমা হৃদয়ঙ্গম না করে সরাসরি উত্তর পেতে গেলেই বিপত্তি বাধে। কারণ, সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে বিচার্য নয়। তার ওপরে থাকে মানুষের সহজ বিশ্বাস। বুদ্ধির নাগাল না পেলে অন্তর্দৃষ্টির শরণাপন্ন হতে হয়।

সমালোচকের মতে, ‘ডাকঘর’এ কোনো নাটকত্ব নেই। গল্প বড়ো একটা নেই, ঘটনাও তেমন নয়; তবুও কবিতার আকারে না লিখে রবীন্দ্রনাথ একে নাটকের আখ্যা দিলেন। নাটকে স্রষ্টা অমলের সঙ্গে মাধব দত্ত, সুধা, মোড়ল, ঠাকুরদা প্রভৃতি চরিত্রকে নিয়ে এসে যে বিচিত্র স্ফটিকব্যূহ রচনা করেছেন তা কবিতায় সম্ভবপর হতো না। কোনো অজানা দেশের মতো এই নাটক যে নিগূঢ় অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা যে-কোনো কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিকে পদে পদে বিস্মিত করে। অনন্তের স্বাদ যেন তরঙ্গায়িত হয় পাঠকের মনে। আমরা যারা নিত্যদিনের জীবনে বসবাস করছি তারা এই মহাবিশ্বের গতিময়তার শুরুও জানি না, শেষও জানি না, শুধু মাঝখানের একটুখানি কাল জানি, যে কালে আমরা বাস করি। কিন্তু অমল তার কল্পনার সাহায্যে অচিন দেশের সন্ধান পায়। আমরা খণ্ডকালকে সত্য ভেবে চেপে ধরতে যাই তাই যথার্থ সত্তাকে পাইনা। এটা কোনো তত্ত্বের কথা নয়। এ হলো দৃষ্টির কথা। ‘ডাকঘর’এর রচয়িতা সেই দৃষ্টির সাহায্যেই কলম ধরেন। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মপ্রকৃতির গভীরতায় বুদ্ধির মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে চৈতন্যকে গুরুত্ব দেন।

© Santiniketan Sahityapath

এখন প্রশ্ন থেকে যায় চিঠি, রাজা, ডাকঘর এগুলি যদি সংকেতবাহী না হয় তবে এর তাৎপর্য কিসে? যদি আমরা নিজদের জীবনের দিকে তাকাই তাহলে কি অস্বীকার করতে পারব যে আমরা বন্ধ জীবন থেকে মুক্তির আশা করি না? আমরা একাধিক জটিলতায় আবদ্ধ। জীবনের ব্যূহে আমরা চক্রাকারে ঘুরে যাই কেবল। কিন্তু কল্পনার আবহে অমল পৌঁছে যায় তাঁর স্বপ্নের কাছে যেখানে রাজার চিঠির অপেক্ষায় জীবনের পরিসমাপ্তি পূর্ণতা পায়। এই মৃত্যু ছেদ নয়। এ হলো পরিপূর্ণতা। মৃত্যু সুদূর। অসীমের ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকে সেখানে। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে রাজার চিঠির সমান্তরলতা কল্পনা করলে রাজার চিঠিকে ছোটো করা হয়। মোড়লের মতো আত্মঅহংকারী মানুষ বিশ্বাস করেন না যে রাজা অমলের মতো একজন সাধারণ সামান্য মানুষকে চিঠি লিখতে পারেন বলে। তাই শূন্য কাগজ দিয়ে মোড়ল অমলকে পরিহাস করেন। কিন্তু রাজদূত এসে জানায় রাজা তাঁর এই ছোট্ট বন্ধুকে নিরাশ করবেন না। তিনি নিজে আসবেন অমলের সঙ্গে বেড়াতে যদিও মোড়লের অক্ষর শূন্য রাজার চিঠি অমল বিশ্বাস করে। কারণ এই রাজার চিঠি তো আসলে আমাদের অন্তরের আশা, নির্ভর করতে পারার ভিতরকার কথা। রবীন্দ্রনাথের রাজারা তো আসলে এমনি হন। তাঁরা অন্তরে বৈরাগী, কোনো ছদ্মঅহংকার তাঁরা ধারণ করেন না। যেমন ঠাকুরদা হলেন রাজার সাথী। তিনি এক মুক্তপ্রাণ মানুষ, ছেলে খেপাবার সর্দার। ঠাকুরদা অমলের বন্ধ ঘরে বাইরের জগতের স্বপ্ন নিয়ে আসেন। তাই মোড়লের পরিহাসের মধ্য দিয়ে ঠাকুরদা সত্য দেখতে পেয়েছিলেন।

২। 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' ২য় খণ্ড, নীহাররঞ্জন রায়, দি বুক এম্পরিয়াম লিমিটেড, ২২/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৪৮, পৃ. ১৪০- ১৪৩ —

নীহাররঞ্জন রায় শ্রেষ্ট সংকেতবাহী রহস্যময় গীতিধর্মী নাটক বলে 'ডাকঘর'কে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত নাটক যেন একটি সংগীত যার সুরের রেশ মনে বাজতে থাকে। তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য সমর্থন বলেন যে 'ডাকঘর'এর অমল কবির বাল্যকালের রুদ্ধ জীবন। কিন্তু তার কল্পনাশীল মন সমস্ত দেখে ও উপভোগ করে। কবিরাজরূপী সংসার ও মোড়লরূপী সমাজের পেষণে অমলের শিশুমন ভারাক্রান্ত। তবু সে সহজ ভাবে বাঁচার আনন্দ ত্যাগ করে বস্তুগত জীবনে মিশে যেতে পারে না।

৩। 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' ২য় খণ্ড, প্রমথনাথ বিশী, মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৫১, পৃ. ১১২ — ১৩১ —

প্রমথনাথ বিশী 'ডাকঘর'কে চিহ্নিত করেছেন তত্ত্বনাট্য বলে। তিনি সমকালীন নানান চিঠিপত্রের উদাহরণ দিয়ে 'ডাকঘর' লেখার প্রাক্কালে এবং পরে কবির মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যা থেকে উঠে এসেছে কবির মনের মধ্যে চেপে বসে থাকা অবসন্ন মনের আর্তি, মৃত্যু বেদনার ভয়, অব্যক্ত চঞ্চলতা। উল্টোদিকে কবিকে পেয়ে বসেছিল দূরে চলে যাওয়ার জন্য বিচিত্র আনন্দ। সে হলো অজানার-অপরিচিতের আনন্দ। অসীমের পানে কী আছে আমরা জানিনা আর যে বিষয়ে আমরা অজ্ঞাত তার প্রতি আমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ তীব্র হয়। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক কবির তিনটি ভাবের উল্লেখ করেছেন — উৎকট মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা, অনির্দিষ্ট সুদূরের পানে চলে যাওয়ার ইচ্ছে ও প্রবাসবেদনার কাতরতা। দৈহিক ও মানসিক একটা নৈরাশ্য ও নিস্ফলতা পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব কবিকে গ্রাস করেছিল। কিন্তু সাময়িক বিভীষিকা এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্বের স্বাভাবিকতা পেয়েছিলেন। ১৯০২-১৯১৩খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কবির জীবনে একটা শঙ্কাজনক সময় কেটেছিল। কেবল দৈহিক স্বাস্থ্য দেখলেও বোঝা যাবে যে পূর্বে এমন দীর্ঘকাল কবি রোগ যন্ত্রণা সহ্য করেন নি। কৃশতা, স্বাস্থ্যহীনতা দিব্যকান্তি কবিকে নিস্তেজ করে তুলেছিল। মনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি রবীন্দ্রনাথকে এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি কাটিয়ে আবারও তাঁর পরিচিত জগতে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

প্রমথনাথ বিশীর মতে 'ডাকঘর' নাটক ওই তিন দশার সম্মিলিত ফল। অমল চরিত্রে এই তিনটি দশা বাদ দিয়ে চতুর্থ কোনো উপাদান নেই। চিঠি ও ডাকঘর দুটোই আসলে প্রতীক। প্রতীক হিসেবে রবীন্দ্রসাহিত্যে চিঠি কোনো বিরল উপাদান নয়। এতে দুটি ভাব নিহিত থাকে। একটা হলো রহস্য আর দ্বিতীয়টি ওই ছোটো চিঠি অবলম্বন করে দূরের কাছে আসা। যে চিঠি প্রতীক নয়, কেবল লৌকিক তারও কিন্তু এই দুটি ভাব বিদ্যমান। দেখে শুনে কথা বলার চেয়েও এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। না দেখেও চিঠির মাধ্যমে নিবিড়তা প্রকাশের আনন্দ পাওয়া যায়। অমলের রাজার চিঠির সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য নেই। সুদূরের জন্য অমলের মন যে লালায়িত হয়ে ওঠে তা ওই চিঠিতে ধরা দিয়ে যেন আসছে। চিঠির রহস্য ও সুখ হচ্ছে দূর ও কাছের মধ্যে সে নিরন্তর দৌত্য করে চলেছে। প্রাবন্ধিকের

© Santiniketan Sahityapath

মতে অমলের মৃত্যু হয়নি। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাজা এসে ডাকলেই আবার উঠে পড়বে। বাইবেল অনুযায়ী পুনর্জীবনের তত্ত্বের সঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মতগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। মৃত্যুর চেয়ে বরং ভাবা যেতে পারে অমলের চোখে নেমে এসেছে এক প্রতীক নিদ্রা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কবিতায় নিদ্রার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

অমল বন্ধ জীবনের পাকে পীড়িত; রাজকবিরাজ এসে অমলের ক্ষুদ্রতর বন্ধতার বন্ধনমোচন করেছেন। রাজা এসে বাকি আগলটুকুও গুছিয়ে দেবেন। তিনি অমলকে বাইরে নিয়ে বেরোবেন। যেন পুর্নজীবন পাবে অমল। এটা এক প্রকার জীবন্মুক্তি বটে। জীবন্মুক্তি মৃত্যুর মুহূর্তেও লাভ করা যায়, আবার বেঁচে থেকেও তার স্পর্শ পাওয়া যায়। তা জীবনেরই এক অংশ। কিন্তু জীবনের অবসান নয়। নতুন করে জীবনকে বাঁচার এক পন্থা। কবি জীবনের ও অমলের আকাঙ্খা একই পথে এগিয়েছে। শুধু, অমলের জাগরণ নাটকের শেষে নেই, তা কবির জীবনে ঘটেছে। অমল কবির জীবনে জেগে উঠেছে। রাজকবিরাজের সান্ত্বনায়, সুধার দেওয়া ফুলে অমলের জীবন্মুক্তি ঘটেছে। আসলে সুধার ফুল হলো প্রেম ভালোবাসারই প্রতীক এবং ঠাকুরদা একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ।

৪। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’, সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৪০এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলকাতা, ১৩৫৩, পৃ. ২৭৩ —

সুকুমার সেন বলেছেন ‘ডাকঘর’ নাটকে কোনো নাটকীয়তা নেই। ‘ডাকঘর’ হলো উপাখ্যানীয়। ‘গীতাঞ্জলি’ শেষ করে ‘গীতিমাল্য’(১৯১৪) লেখার ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ ‘রাজা’, ‘অচলায়তন’ ও ‘ডাকঘর’ লেখেন। ‘অচলায়তন’ লেখার ছয় সাত মাসের মধ্যে ‘ডাকঘর’ লেখেন। পরবর্তীকালে ‘ফাল্গুনী’ (১৯১৬) নাটকের সূচনাতেও কবিশেখরের উক্তিতে ‘ডাকঘর’এর ভাববীজ খুঁজে পান সুকুমার সেন।

প্রাবন্ধিকের মতে ডাকহরকরা অপ্রত্যাশিতের আনন্দের উৎস। চিঠির মাধ্যমে কারুর আসার কথা ধ্বনিত হয়। এটাই উপযুক্ত রূপক এখানে। অজানার আনন্দ বন্ধন ছেদ করে মুহূর্তকে অনেক সহজ করে দেয়। তবে, ‘ডাকঘর’এর এই রূপকের ব্যবহার কোথাও সরল আখ্যানকে ছাপিয়ে যায়নি। নাটকে গান না থাকার প্রসঙ্গে তাঁর মত হলো এই যে শিশু অমলের গানে রস পাবার মতো বয়স হয়নি বলে কোনো গান আলাদাভাবে ‘ডাকঘর’এর জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নি। তিনি সুধাকে অবুঝ ভীরু প্রেম বলেছেন।

৫। ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’, শঙ্খ ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১৮৪-১৯০ —

শঙ্খ ঘোষের মতে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবি নামের কিছু মানুষ থাকেন তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু সমগ্র সত্তার মধ্যে দিয়ে জীবনকে পেতে চাইলে সেখানে চলে আসেন ঠাকুরদা। জীবনকে বুঝতে, সুন্দরের চোখ মেলে দেখতে চায় অমল। সমগ্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি মিশিয়ে কবি স্বভাব নিয়ে যারা আসে রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোটো কিন্তু সব থেকে বড়ো হলো অমল। আমাদের জীবনের আশ্চর্য বিরোধ হলো জীবনে আমরা প্রাত্যহিকের মধ্যে বড়ো বেশি অভ্যস্ত বলে প্রত্যহকে দেখতে পাইনা। আমাদের দেখার চোখে বস্তু বিশ্বের আবরণ চাপা পড়ে থাকে। ভুলে যাই ভালোবাসার মধ্যে একই সঙ্গে ঔদাসীন্য ও লিপ্ততা মিশে থাকে। লিপ্ত হয়ে থাকার মধ্যেও এক নির্লিপ্ততা থেকে যায় বলেই সুন্দরের সঙ্গে বিষাদ জড়িয়ে থাকে। এখানে মৃত্যু উপলক্ষ মাত্র। অমলকে দেখা যায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রবীন্দ্রনাথ যেন অভিমান তৈরি করে রেখেছেন চরিত্রের চলায় বলায়। অমলের মধ্যে সেই বেদনা আমরা অনুভব করতে পারি। বন্ধতা থেকে মুক্তির আশায় তার সহজ শিশুমন পাড়ি দেয় কল্পরাজ্যে। সে পন্ডিত বিনা সব হতে চায়। এমনকি ভিক্ষা করার মধ্যেও অমল নতুনত্বের হদিশ পায়। বস্তুত এ হলো সময়বোধের বিষাদ। অমল চলে যায় সময়ের দেশে। সেইজন্যই প্রহরী যখন বলে সেই দেশে একদিন সবাইকেই যেতে হবে, অমল মনে করে তা কোনো স্বপ্নরাজ্যের দেশ। কিন্তু প্রহরী মৃত্যুর দেশের কথা বলে। আবার ফকির যে দেশের কথা বলে তা সুন্দরের অর্থ বোঝায়। সে দেশে নীল পাহাড়ের সূর্যাস্তে সবুজ পাখি উড়ে যায়। কালের মাত্রায় জেগে ওঠা দেশ আমাদের সামনে এমনি করে এক রূপ থেকে আরেক রূপে বদলে যায়। অমল যেন ঘটনাকে ছুঁয়েও তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সবটা দেখছে, সমস্তের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করছে। সুন্দরের হাত ধরে সে চির নতুনের প্রবাহে মিশে যেতে চাইছে। এই দেশই হয়ে উঠছে অমলের রাজা।

© Santiniketan Sahityapath

৬। 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ' অখণ্ড, পবিত্র সরকার, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, মার্চ ২০০৮, পৃ. ১৮৭ - ২০০ —

পবিত্র সরকার বলেছেন যে দেশে বিদেশে 'ডাকঘর'এর অভিনয় ও অনুবাদের জনপ্রিয়তা দেখলে মনে হয় মুক্তির এই ভাষ্য বুঝি অতি সরল। এতে 'ডাকঘর'এর গভীর আবেদন ব্যাহত হয়। 'ডাকঘর'এর অমল খানিকটা তার স্রষ্টার মতোই সুদূরের পিয়াসী। দূরের ডাক অমলকে নিয়ে চলে মৃত্যুর ছদ্মবেশে। তবে নাটকের শেষে অমলের মৃত্যু পাঠকের কাছে একটা শিল্পিত রূপ নেয়। মঞ্চে ঘুম আর মৃত্যুর সমীভবন ঘটে একই সঙ্গে; মুক্তি কথাটা আসে ব্যঞ্জনায়। কবিরাজের বলা, 'ঘুম এল', 'ঘুম আসছে', 'ঘুম এসেছে' এবং 'ঘুমিয়ে পড়েছে' এই চারটি বাক্যের মাধ্যমে মৃত্যুর প্রক্রিয়া বোঝানো হয়েছে নাটকে। সুধা ফুল নিয়ে এলেও আর অমল জেগে ওঠে না। মন আর শরীরের একটা বিরোধাভাস তৈরি হয় মঞ্চে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কোনো রাজকীয় মাহাত্ম্য দান করেন নি। অমলের মৃত্যুকে মৃত্যু বলে জেনেছে ঠাকুরদা, প্রহরী ও রাজকবিরাজ। মাধব দত্ত অমলের ঘুমিয়ে পড়ায় যখন প্রশ্ন করে তারার আলোয় তার কি হবে, ঠাকুরদা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলেন। অধ্যাপক সরকারের মতে বহুরূপীর 'ডাকঘর' অভিনয়ে শম্ভু মিত্রের মাধব দত্তকে ধমক দিয়ে বলা "চুপ করো/ অবিশ্বাসী" কথাটার মধ্যে একটা কান্না ছিল। একটা শিল্পিত প্রতিমা গড়ে তোলাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। নির্মিতির ওপর ভর করেই এই নাটক দ্ব্যর্থক হয়ে উঠেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডা. এলিজাবেথ কুবলার রসের বক্তৃতায় পবিত্র সরকার শুনেছিলেন মানুষ মৃত্যুর আগে নিজের সমস্ত প্রিয় জিনিস অন্যকে স্বচ্ছন্দে দিয়ে দেয়। হয়তো যে জিনিসটা দেওয়া নিয়ে সে দুদিন আগেও তার আপনজনের সঙ্গে কলহ করেছে কিন্তু মৃত্যুর ডাক পেলে সে আপনা হতেই আসক্তির তার ছিঁড়ে ফেলে। এই বক্তব্যের সঙ্গে অমলের সাদৃশ্য পেয়েছিলেন প্রাবন্ধিক। অমল নিজের খেলনাগুলি অবলীলায় তার বন্ধুদের দিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যু আর মুক্তি 'ডাকঘর'এ নাটকে ধরা দিয়েছে একসঙ্গে। মৃত্যুই যেন নাটকে গভীর আবেশে দ্যোতিত হয়ে উঠেছে।

৭। 'রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য', শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা, ১ অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ. ১৩৮-১৫৫ —

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত 'ডাকঘর'কে বলেছেন রূপক নাট্য। তাঁর মতে নাটকে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সার্থক মিলন ঘটেছে। পৃথিবীর সকল কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত। জীবাত্মার রূপ হলো অমলের সপ্রেম দৃষ্টি। নিজের মনের মাধুরী দিয়ে সে সব স্পর্শ করতে চায়। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে দেখতে চায় অমল। তাই যে মানুষটা ঝর্ণা তলায় বসে ছাতু খায়, অমল তার মতো হতে চায়। কখনো দইওয়ালা, কখনো প্রহরী আবার কখনো ডাকহরকরা হবার জন্য অমল উৎসুক হয়ে থাকে। মুক্তির জন্য তার বাইরে বেরোনোর আকাঙ্খা ফুটে ওঠে।

আত্মা শিশুর মতো বিশুদ্ধ এবং নিজের ইচ্ছে চলে। যীশুর বাণী আছে যে শিশুরাই স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে। এই আত্মাকে আটকে রাখার প্রয়াস কম নয়। অবিদ্যার দ্বারা আবৃত থাকে বলে তার স্বরূপ চেনা যায়না। যেদিন নিজের স্বরূপ সে চিনে নেয় সেদিন তাকে রোধ করা যায়না। আত্মার মুক্তি ফলে অমলের মন থেকে অবিদ্যার অপসারণ ঘটেছে। সে ফকিরকে বলেছে সকাল থেকে সব অন্ধকার হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে সব স্বপ্ন। বুদ্ধি অপেক্ষা স্বজ্ঞার দ্বারাই সত্য নির্ণয়ের সম্ভবনা অধিক। এখানে বিবেকানন্দের ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা করে প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভগবানের যাঁরা উপাসনা করেন ভগবান তাঁদের বুদ্ধি এমন ভাবে চালনা করেন যাতে ঈশ্বরকে তাঁরা লাভ করেন। তাই অমল অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা রাজার কাছে যেতে চায়। জীবাত্মা সব বন্ধন ছিঁড়ে পরমাত্মার দিকে যাত্রা করে। ডাকঘরের অভিনয়ের সময় অবনীন্দ্রনাথের তৈরি করা শূন্য দাঁড়ের ব্যবহার দেখে শান্তিকুমার দাশগুপ্ত মনে করেন, তা হলো এই তত্ত্বেরই উদাহরণ। রাজার চিঠি মৃত্যু নয়। পরম সুন্দরের আহ্বান। জীবাত্মা মিলনের জন্য উদগ্রীব হলে পরমাত্মার চিঠি আসতে বাধা থাকে না। চিঠি এবং অমলের ঘুম মৃত্যু নয়। আত্মার পার হবার জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন নেই। শুধু প্রতীক হিসেবে মৃত্যুর ব্যবহার হয়েছে। প্রদীপ নেভাবার অর্থ আত্মা নির্বাণ লাভ করেছে। সে আর সংসারের ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ নয়। মুক্ত আত্মাকে অন্তরের পথ দেখাবে আকাশের তারা।

© Santiniketan Sahityapath

৮। ‘রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা’, অশোক সেন, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮২, পৃ. ২৯৫

অশোক সেন শ্রেষ্ট সাংকেতিক নাটক হিসেবে ‘ডাকঘর’কে নির্বাচিত করেছেন। পার্থিব জীবনের মানবাত্মা ক্রমাগত আটকে পড়ে অস্থির হয়। মুক্তির জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন ঈশ্বরের কৃপায় মৃত্যুরূপে মুক্তির আবির্ভাব হয়। সাধারণের কাছে এটা মৃত্যু কিন্তু মৃত্যু আসে মুক্তিদূত হয়ে। ‘ডাকঘর’এর সঙ্গে হাউপটম্যানের ‘হানেল’র তুলনা করেছেন তিনি। উভয় নাটকেরই কেন্দ্রীয় চরিত্র শিশু এবং মৃত্যুদৃশ্য দিয়ে নাটক শেষ হয়। শিশুমন নিষ্পাপ তাই দেশকাল ভেদে ঈশ্বরের মহিমা শিশুর কাছেই প্রতিভাত হয়। ইউজিন ও নেইল-এর ‘বিয়ন্ড দ্য হরাইজন’ নাটকের সঙ্গেও সাদৃশ্য পেয়েছেন ‘ডাকঘর’এর। নাটকের নায়ক দিগন্তের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে বাইরের বিশ্বে ছুটে যেতে চায়। অমলও তাই চায়। অশোক সেন বলেছেন ‘ডাকঘর’ পূর্ণাঙ্গ সাংকেতিক নাটক। স্পষ্ট আখ্যানভাগ ও গুপ্ত আখ্যানভাগ পৃথক করা যায় না। ব্যাচ্যার্থ ব্যঙ্গার্থ দ্বারা পূর্ণতা পায়।

অমলের সঙ্গে কবির বাল্যকালের রুদ্ধ জীবনের ছবির সাদৃশ্য পাওয়া রবীন্দ্রনাথ আরো একটা সত্য ফুটিয়ে তোলেন এই নাটকে। তা হলো আমাদের আশেপাশের অনেক জিনিস সুন্দর। আমরা সহজে সেসব পাই বলে মূল্য দিই না। অমল প্রকৃতির গন্ধ পেয়েছে জানলা দরজার ফাঁকে। ঘরে আটকে থাকার বন্ধতা তাকে সামান্য জিনিসেরও রহস্য, আনন্দের সন্ধান দিয়েছে।

৯। ‘রবীন্দ্র নাট্যধারা’, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলকাতা সংস্কৃতি প্রকাশন, ১৩৭৩, পৃ. ৩৩৭-৩৪৬ —

আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাবের দিক থেকে ‘ডাকঘর’কে ‘রাজা’ নাটকের পরিপূরক বলেছেন। কিন্তু কাহিনি পরিকল্পনার দিক থেকে ডাকঘরের অন্য বৈশিষ্ট্য আছে। পাশ্চাত্যের ক্ষীণতম অনুভব আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘ওড অন ইম্মর্টালিটি’ কবিতার শিশুর সঙ্গে মিল আছে অমলের। আর্থ চরিত্রের সঙ্গে মাধব দত্তের সাদৃশ্য পেয়েছেন। রসের নিবিড়তা নাটককে ব্যঞ্জনাবাহী করে তুলেছে। এই কাহিনির সবচেয়ে সাংকেতিক চরিত্র রাজা বিশিষ্ট চরিত্র হিসেবে নাটকে স্থান পায়নি। রাজার কোনো উপস্থিতিই এই নাটকে নেই। অব্যক্ত অরূপ ও অসীমের প্রতি সংকেত মাত্রই সাংকেতিক নাটকের লক্ষ প্রস্ফুটিত হয় এই কাহিনির ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। তাই আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে ডাকঘর। নাটকে কোনো অভিনবত্ব না থাকলেও ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-কবিমানসের আত্মকেন্দ্রিক ভাবানুভূতির রূপায়ণ ডাকঘরে লিখিত রূপ পেয়েছে। প্রাবন্ধিকের দাবি এই যে রাজার পরিণতি প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট নয় বলে তা গভীর ভাবে অন্তর স্পর্শ করতে পারেনি। স্বয়ং নাট্যকার ‘ডাকঘর’ নাটককে একবার বলেছেন গদ্য লিরিক, পরে বলেছেন আখ্যায়িকা। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুআরি এক চিঠিতে পরিহাসের ভঙ্গিতে লিখেছিলেন — ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী — রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না, কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।[৩] তাঁর এই উক্তিকে ভিত্তি করে অনেক প্রাবন্ধিক মনে করেন রবীন্দ্রনাথ অমলের মৃত্যু ঘোষণা করেন নি। আসলে অমল ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু রাজা এসে ডাকলেই তার ঘুম ভেঙে যাবে। এ হলো রূপক নিদ্রা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ‘ডাকঘর’ নাটক। নাটকের নির্বাচিত একাধিক বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা অবগত হলাম যে ‘ডাকঘর’র পাঠ নানা পণ্ডিতজনের কাছে পৃথকভাবে বিচার্য হয়েছে। কেউ ‘ডাকঘর’কে রূপক সাংকেতিক নাটক বলেছেন, কেউ বা মুক্তির হদিশ পেয়েছেন; আবার প্রতীকের ইশারায় নাটকটি হয়ে উঠেছে গীতিময়। সর্বোপরি বলা যায় মুক্তির আলোকে এবং অবগুণ্ঠন মোচনে ‘ডাকঘর’ নাটক হয়ে উঠেছে অনির্বচনীয়।

তথ্যসূত্র:

১। ‘গীতবিতান’ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ২৩৪

২। ‘গীতাঞ্জলি’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ১৩১৭, পৃ. ১৯

৩। ‘ডাকঘর’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, ১৩১৮, পৃ. ৭৭

—

© Santiniketan Sahityapath